সূর্যোদয়ের ঘোষক —

অঞ্জন চক্রবর্ত্তী

বাংলা কাব্যজগতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার সূর্যোদয় বোধহয় সেই লগ্ন যখন বাংলা কবিতার মাটি ডানা মেললো স্বর্গের দিকে। অতঃপর আমরা এক আশ্চর্য সূর্যস্নাত জীবনযাত্রা দেখে চললাম যতক্ষণ না শ্রাবণের মেঘ তাকে একটু একটু করে ছেয়ে ফেলে লিখলো 'বাইশে শ্রাবণ'। এই অনিন্দ্য রবিকরের বেশ কিছুদিন আগে মধুকবি এক ঘন তমসায় আলো ঝরানোর ব্রতে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন — হইলো, হইলো প্রহর / দিনকর প্রাচীতে উদয়। সুস্থিত সূর্যোদয়ের আগে তিনি যেন পান করে গেলেন অন্ধকারের হলাহল!

হ্যাঁ, তাঁর ভুল ছিলো। প্রথমতঃ, মধুসূদন যে সময়ে সাহিত্যচর্চায় এলেন তখনও পুঁজিতে স্বাজাত্যাভিমানের রং। এখনকার বিশ্বায়নের দিনকালে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে উৎপাদনের সামাজিকীকরণ ও প্রসারণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এন আর আই ঝুম্পা লাহিড়ীদের তাই ইউরোপীয় সাহিত্যিক হয়ে উঠতে অসুবিধে হয় না। মধুসূদনের সময়ে কিন্তু এটা সম্ভব ছিলো না। তিনি বোঝেন নি যে ইউরোপীয় সাহিত্য - কৌলীন্য ও বাজার ইংরাজী সাহিত্যের মতো মধুমাখা নয়। তাই জোর ধাক্কা খেলেন তিনি। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপ কিছুটা অস্বস্তিতে ছিলো, তাই 'গীতাঞ্জলি'র প্রলেপ ভালো লেগেছিলো তাদের। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে নিছক বিবেকের চুলকানির মলম নন, এক গভীর উপলব্ধির প্রেমের কবি সেটা তারা বোঝার চেষ্টা করে নি। অনেক বিশিষ্টের রবীন্দ্রপ্রেম তাই অল্পেই ঘুচে যায়। দ্বিতীয়তঃ, মধুসূদন বোঝেননি তলায় তলায় তিনি 'দত্ত মহামতি'র ছেলে শ্রীমধুসূদন, আপন সম্পদের প্রতি সামন্ততান্ত্রিক দর্পী গর্ব যাঁর মধ্যে ষোল আনা। প্রথম প্রসঙ্গে ধাক্কার উপলব্ধিতে দ্বিতীয়টি জ্বলে উঠলো বায়রণীয় জ্বালায়, শ্লেষে ঃ

কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়, মন;
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,-
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!

ইউরোপীয় কবি হয়ে উঠতে চেয়ে অপচয়ের অগ্নিপথে হেঁটে দগ্ধ হয়েছেন মধুসূদন। কিন্তু এই বিচরণপথেই তিনি সংগ্রহ করেছেন রেনেসাঁস মনীষার পাথেয় যা ঔপনিবেশিক ভারতে পূর্ণ বিকশিত ও ব্যাপ্ত হয়ে উঠতে না পারলেও তার দীপ্তি আলোকিত করেছে বাংলার ভুবনকে। রেনেসাঁস মননের উপাদান হিসেবে যা বিশেষভাবে গণ্য করা হয় সেই সৌন্দর্যের প্রতি, জ্ঞানের প্রতি, সম্প্রসারণের প্রতি তাঁর আকর্ষণ স্পষ্টতই ফুটেছে তাঁর কাব্যজীবনে। যে দেশে, যে সময়ে তিনি

জন্মেছিলেন তাঁর মধ্যে ছিলো এক অসহ্য বদ্ধতা যার বিরুদ্ধে তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতার' জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় জেহাদ ঘোষিত হয়! কিন্তু নিজের জীবন দিয়েই মধুসূদন বুঝেছিলেন প্রমত্ততা এর সমাধান নয়, চাই সমান্তরাল ভুবনের নির্মাণ। তিনি বহুভাষাবিদ, বহু সাহিত্যের রস তিনি আকণ্ঠ পান করেছেন। একাকার করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে তাঁর সংগৃহীত মণি-মাণিক্যকে। দু বার বিবাহ করেছেন মধুসূদন, এছাড়াও অনেক নারী এসেছেন তাঁর জীবনে। কিন্তু কবিতার মধ্যে যে সৌন্দর্য তিনি দেখেছেন তাই তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সারাজীবন। তিনি এক কাব্য স্পৃষ্ট মানুষ যাঁর চোখে ধরা পড়েছে সাহিত্যের, ভাষার সৌন্দর্য ঃ

কুসুমের সার
কবিতা কুসুম-রত্ন! দয়া করি নরে,
কবি-মুখ-ব্রহ্ম-লোকে উরি অবতার
বাণীরূপে বীণাপাণি এ নর-নগরে (কবিতা)
মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা! - শত ধিক তারে! ভুলে সে কি করি,
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী? (ভাষা)
বড়ই নিষ্ঠুর, আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে (মিত্রাক্ষর)

ওথেলো নাটকে তার ভালোবাসার প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওথেলো বলেছিলো, 'one who loved not wisely but too well'। মধুসূদন বড় ভালোবেসেছিলেন কবিতাকে যাতে মিশে গেছিলো রেনেসাঁসের অন্তর্লীন কিছু অপচয়ী evilও। জ্ঞানপিপাসু ফাউস্টাস যে কিভাবে অদম্য জ্ঞানের স্পৃহায় মেফিস্টোফিলিসের ফাঁদে পড়েন তা আমাদের দেখিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের রেনেসাঁসের কবি মার্লো। মধুসূদন শুধু কবি হওয়ার তাড়নায়, আরো ভালো কবি হওয়ার উন্মাদনায় পুড়েছেন সারাজীবন। পুড়তে পুড়তে যে সুবর্ণপ্রভার সৃষ্টি তাতে স্বর্ণিল হয় প্রভাতের মেঘ। বাকি কাজের জন্য রইলেন 'ভোরের পাখী' বিহারীলালের ডাকে বিকশিত রবি!

রেনেসাঁস মনীষার আরেকটি দিক ছিলো তাব (humanism) মানববাদ। মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। তার মধ্যে লীন রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। Hamlet র ভাষা ধার করে বলতে হয় - How noble in reason! how infinite in

faculties! in form and moving, how express and admirable! the beauty of the world, the Paragon of animals! 'Small latin and less greek' জানলেও রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র মহাকবি শেক্সপিয়রের হৃদয়ে লেখা ছিলো। মধুসূদনের কাব্যে আমরা টের পেলাম সেই মানবমুখিতা। 'বঙ্গ ভূমির প্রতি' কবিতায় দেশ ছেড়ে যাবার দুঃখ এবং বিদেশে মৃত্যুর আশঙ্কার পাশাপাশি ব্যক্ত হয়েছে মানুষ কিভাবে মানুষের বিচারের উপর ভর করেই অমরতা পেতে পারে ঃ

সেই ধন্য নরকূলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন।

যদি মানুষ তাঁর গুণের প্রশংসায় তাঁকে মনে রাখে তবে তিনি অমর হয়ে উঠবেন। দেশমাতৃকার কাছে বর প্রার্থনা করে তিনি চির অমলিন থেকে যেতে চান। দেশমাতা এখানে 'চণ্ডীমঙ্গল' বা 'মনসামঙ্গল' কাব্যের অঘটন পটিয়সী অলৌকিক শক্তি নন, দেশবাসীর ভালোবাসারই মূর্ত প্রতীক। মানবাত্মার এই দৈবীকরণই রূপ নিলো তাঁর কবিতায় যার দৃষ্টান্ত আরো পাই আমরা ঃ

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! - উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

আমরা শেষ করবো ঠিক যেখানে মধুসূদন থামিয়েছেন তাঁর চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী ঃ

ডুবিল সে তরি,
কাব্যমদে খেলাইনু যাহে পদ - বলে
অল্পদিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে
(যদিও অধম পুত্র, মা কি ভুলে তারে?)
এবে - ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে -
জ্যোতির্ম্ময় কর বঙ্গ - ভারত - রতনে!

'হতভাগ্য' মহান কবির এই আলোক পিপাসা, স্বদেশের তিমির বিনাশের প্রতি অদম্য এই স্পৃহার কিরণরেখা মনে এঁকেই আমাদের মানবতীর্থ পরিক্রমার পালা শেষ করলাম।